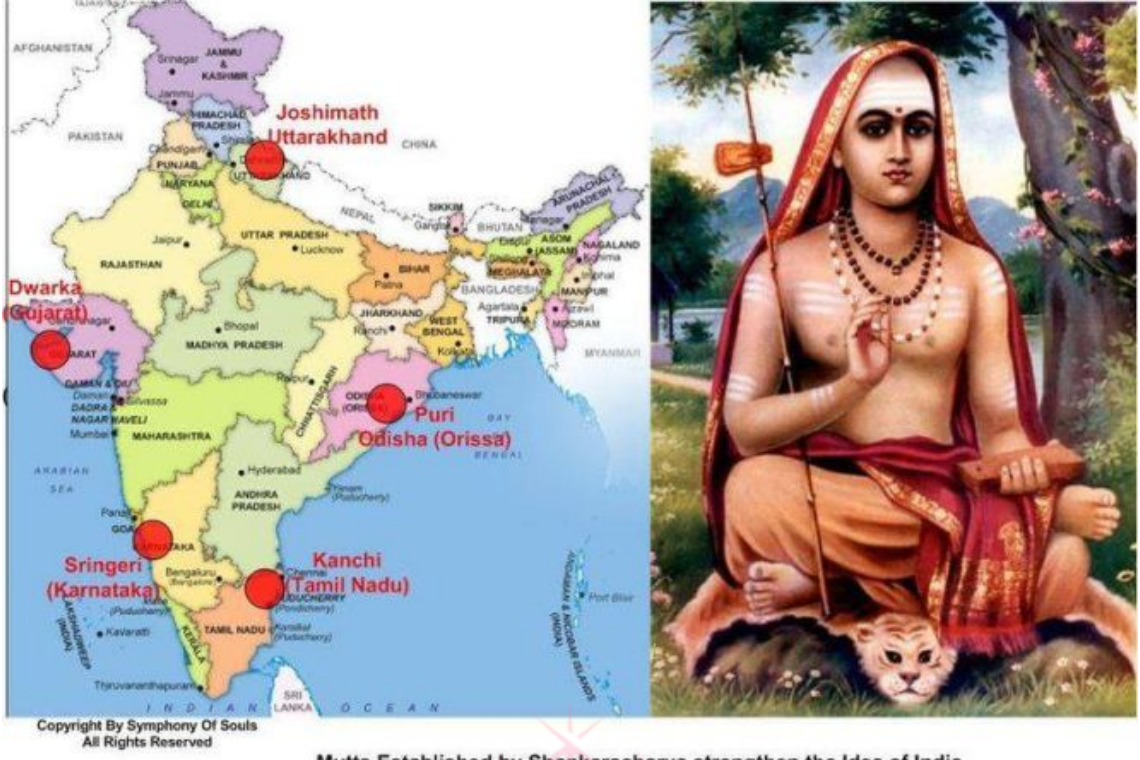


✖ Sanatan Dharma



আচার্য শঙ্কর

বহির্ভিন্ন মত এবং পথ শতধা বহির্ভিক্ত সনাতন ধর্মকরে রক্ষার জন্য যুগে যুগে বহির্ভিন্ন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। সনাতন ধর্ম শাস্বত এবং ঈশ্বর প্রবর্ততি একমাত্র মুক্তির পথ। চরিকালই এ ধর্ম ছিল আছে এবং থাকবে। এর কোন বনিশ নই কারণ ঈশ্বর স্বয়ং এ ধর্মে প্রবর্তক এবং রক্ষাকর্তা। তাইতো যুগে যুগে এ ধর্ম কখনো সঙ্কুচতি অথবা কখনো প্রসারতি অবস্থায় থাকে। এমনই এক সঙ্কুচতি ঘোর দুর্দনিতে ভগবানের দবি্য ঐশ্বর্যের কঞ্চিত কণা নিয়ে আমাদের মাঝে আসনে এবং আলোর পথ দেখান শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য। তাঁর জন্ম ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১২ বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তথিতিে করোলা প্রদেশের ‘কালাদি’ নামক একটি ছোট্ট গ্রামে। পিতা শবিগুরু এবং মাতা বশিষ্টি দবী।

জন্ম থেকেই অসাধারণ মধো, প্রজ্ঞা এবং ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন আচার্য শঙ্কর। মাত্র তনি বছর বয়সই তনি তাঁর মাতৃভাষা মালয়ালম পড়া-লেখের দক্ষতা অর্জন করেন। এর ধারাবাহিকিতায় তাঁর বয়স যখন সাত বছর তখন তনি বিদেবদোন্সহ বহির্ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এবং ব্যাকরণে পাণ্ডতি্য লাভ করেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার যা শুনতেন পরক্ষণই তার অবকিল বলে দতিে পারতেন।

সনাতন সত্য ধর্মে বজিয় পতাকা দকিে দকিে উড্ডীন করার জন্যে আচার্য শঙ্কর হাজার হাজার কলিোমটার পথ পায়ে হটে বেড়িয়েছেন। পূর্বে কামরূপ (আসাম), ঢবাক (ঢাকা) থেকে পশ্চিমিে গান্ধার (আফগানিস্তান) এবং দক্ষিণিে তামলিনাডু থেকে উত্তরে তবিবত সর্বতর তনি প্রচার করে বেড়িয়েছেন বৈদিক ধর্মদর্শন। বৈদিক সংস্কৃতি পুনরুদ্বারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত এবং ঈশ্বরই ছিল তাঁর

জীবনরে একমাত্র ধ্রুবতারা।

সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজকোষ শূন্য করে দিয়ে বৌদ্ধমত প্রচারের নশোয় পাগলপ্রায় হয়ে যান। তিনি যুবসমাজকে কর্মবম্মিখ সন্ন্যাসের পথে প্রোৎসাহিত করেন। তিনি সৈন্যবলকে অসার ধর্মবলে রূপান্তরিত করেন। এর ফলে ভারতবর্ষের বাদিশী শক্তির প্রতরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং ভারতবর্ষ পরণিত হয় দুর্বলচিত্ত কলীবরে দেশে। ভারতবর্ষের সাথে যুগপৎ সনাতন বৈদিক ধর্মেরও এক মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিতি হয়। নাস্তিকি বৌদ্ধ মত এদেশকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, বৈদিক ধর্মের প্রাণকেন্দ্র কাশী বনোরস, (উত্তর প্রদেশ) পর্যন্ত নাস্তিকি মতে মর্যিমান হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে কাশী তখন পূজার অভাবে গোচারণ ক্ষেত্রে পরণিত হয়। এমনবিবীভৎস সময়ে ধুমকতের মত আচার্য শঙ্করের আবর্ভিভাব। তিনি বিভিন্ন নাস্তিকি এবং অবৈদিক অপসম্প্রদায়গুলোকে স্তব্ধ করে দিয়ে সত্য সনাতনের চরিন্তন পথে আমাদের প্রবুদ্ধ করেন।

সনাতন ধর্ম পঞ্চমতে বভিক্ত- সটোর, শাক্ত, শবৈ, গাণপত্য এবং বৈষ্ণব। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরিতার কারণে এ পঞ্চ মতাবলম্বীরা নজিদের মাঝে সর্বদাই সাম্প্রদায়িকি কলহে লপিত থাকত। এ গুরুতর সমস্যা সমাধানে অগ্রনায়ক হলেন আচার্য শঙ্কর। তিনিই প্রথম সার্বজনীন উপাসনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং সব দেবতার পূজার আগে পঞ্চমতের প্রতিনিধিত্বকারী পঞ্চদেবতার (সূর্য, শক্তি, শবি, গণেশ, বশিষ্ঠ) পূজার বধিান দান করেন। এ বধিান প্রাচীনকালে ছিল কনিতু মাঝে অবলুপ্ত হয়ে যায়। আচার্য পুনঃ এ বধিান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতষ্টিত করেন। ফলে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকি ভ্রাতৃঘাতী হিংসা-হানাহানী বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের পূজায় ব্যবহৃত অধিকাংশ পদ্ধতিই তাঁর নরিদশেতি। আধুনিকি হিন্দু জাতিকে প্রথম একটি সাংগঠনিকি রূপ দনে শঙ্করাচার্য। তিনিই প্রথম সনাতন ধর্ম রক্ষায় সংঘের পূর্ণাঙ্গ ধারণা দনে। অবশ্য সংঘের ধারণা প্রাচীনকাল থেকে ছিল কনিতু তা ছিল বচ্ছিন্ন, অপূর্ণাঙ্গ এবং প্রয়োগহীন। তাঁর প্রবর্ততি সংঘই ধর্ম রক্ষায় একটি শক্তিশালী প্রতষ্টিঠানে পরণিত হয়। এ প্রতষ্টিঠানই ‘শঙ্কর মঠ’ নামে আমাদের কাছে পরিচিত। ‘শঙ্কর মঠ’ কোন একক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পরবর্তে ভারতবর্ষের চারপ্রান্ত থেকে চারটি মঠের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। এ চারটি মঠ ছিল সনাতন ধর্ম রক্ষায় চারটি দুর্গের ন্যায়। সনিধু, সটাবীর, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমিঞ্চলের জন্য শারদা মঠ; অঙ্গ, বঙ্গ, কলঙ্গ, মগধ, উৎকল, গট্টা, সুক্শ্ম, পটান্ডর, ব্রহ্মপুত্র তীরবাসীসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের জন্য গোবর্দ্ধন মঠ; কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কম্বোজসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলের জন্য জ্যোতি মঠ এবং অন্ধ্র, দ্রাবড়ি, কর্ণাট, করেল প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের জন্য শৃঙ্গরী মঠ। শঙ্করাচার্য এ চার মঠের আচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম চার শষ্যকে সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তটক এবং হস্তামলক। এ চার আচার্য চার মঠ থেকে চার বদের পূর্ণাঙ্গ বৈদিকি জীবন বধিানের শঙ্কিষা দতিে থাকনে দকিে দকিে। ফলে সনাতন ধর্ম একটি সুদূর সাংগঠনিকি রূপ পায়।

শঙ্করাচার্য অধ্যাত্ম পথের পথকি এবং সাধারণ গৃহীদের মাঝে ধর্মীয় শঙ্কিষা দানের জন্য চার মঠের অন্তর্ভুক্ত একদল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন যারা ‘দশনামী সন্ন্যাসী’ সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ফলে ভারতবর্ষে তরৈি হয় শক্তিশালী এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ধর্মীয় মত, পথের সংগঠন এ চারমঠ এবং দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত। সন্ন্যাসীর আত্মপরচিয় এই পর্যায়ে স্বামী ববিকোনন্দর ববিরণ থেকে জানা যায় ‘শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ’ শঙ্করাচার্যের শৃঙ্গরী মঠের অধিভুক্ত একটি স্বতন্ত্র

প্রতীক্ষিত। গট্টাডীয় বৈষ্ণব মতের প্রাণপুরুষ শ্রীগট্টারাঙ্গদেবে দুজন গুরুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা এবং সন্ন্যাস নিয়েছিলেন; তাঁরা হলেন শ্রী ঈশ্বরপুরী এবং শ্রী কশেব ভারতী। তাঁরা দুজনই শৃঙ্গেরী মঠভুক্ত সন্ন্যাসী। এমনকি যের নামে শ্রীগট্টারাঙ্গদেবে আমাদের মাঝে খ্যাত ‘শ্রীচৈতন্য’; এই ‘চৈতন্য’ নামটি শৃঙ্গেরীমঠভুক্ত ব্রহ্মচারী উপাধি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যও শঙ্করাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত সন্ন্যাসী।

শঙ্করাচার্য তাঁর বত্রিশ বছরের সামান্য আয়ুতে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনা এখনো পর্যন্ত ১৫১ খানা গ্রন্থেরে সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে বদে এবং বদোন্ত দর্শনের ভাষ্য গ্রন্থের উপর ২২ খানা। এ ২২ খানা ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে ধরা হয় ‘ব্রহ্মসূত্র’ ভাষ্যকে। এ সূত্র ভাষ্যতাই তিনি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তিমূলক প্রতীতি স্থাপন করেন। আত্মতত্ত্ব এবং প্রকৃত বৈদিক জীবন লাভের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক আদেশ, উপদেশ এবং প্রকরণ গ্রন্থের সংখ্যা ৫৪ খানা। দেবদেবীরে স্তবস্তুতিমূলক গ্রন্থ ৭৫ খানা। প্রচলিত অধিকাংশ স্তব স্তুতিই এ গ্রন্থগুলি থেকে নেয়া। অসাধারণ তার ধ্বনিসৌন্দর্য এবং অসাধারণ তার পদলালিত্য।

আচার্যের জীবনের একটি প্রধান কীর্তি হল শ্রেষ্ঠ পবিত্র মন্দিরগুলিতে ভগবদ্বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা। জগন্নাথ ধামে কালযবনের অত্যাচারকালে মন্দিরেরে সর্বোচ্চ পাণ্ডাগণ জগন্নাথ বিগ্রহেরে উদর প্রদর্শন স্থিতি রত্নপটেকা চলিকা হরদে তীরে ভুগুতে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু দুঃখেরে বিষয় কালক্রমে উক্ত স্থানেরে লোকেরা ভুলে যান রত্নপটেকা রাখার স্থানটিকে। আচার্য শঙ্কর যোগবলে জগন্নাথেরে রত্নপটেকা রাখার স্থানটিকে নির্ধারণ করে দেন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বদরিকাশ্রমে নারায়ণ বিগ্রহও তিনি অনুরূপভাবে প্রকাশিত করেন। আচার্য শঙ্কর ছিলেন যুক্তবিত্তির এক অত্যাশ্চর্য্য বিগ্রহ। তিনি যুক্তি বহীন কোন কথা বলতেন না। যে কথাই বলতেন তার পছন্দে থাকতো তাঁর কৃষ্ণধার যুক্তি। সে অকাট্য যুক্তির জাল ছিন্ন করা ছিল দুঃসাধ্য। কারণ তিনি ছিলেন সত্যেরে প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি যা বলছেন তাই সত্যেরে রূপান্তরিত হয়ে। তিনি বৈদিক ধর্মেরে পুনরুত্থান ঘটালেন শুধুমাত্র যুক্তি, মধো, প্রজ্ঞার সহায়তায়। না কোন রক্তপাত না কোন হানাহানি, না কোন রাজশক্তির ক্রমতার অপপ্রয়োগে। কোন কিছুই ধ্বংস করেন নি, করেছেন সৃষ্টি, পুনঃপ্রবর্তন। বশিষ্ঠ-ব্যাসেরে ন্যায় মধো প্রজ্ঞার সাথে অসাধারণ সারল্য, লাভন্য ছিল তাঁর সারা দেহে, তাই তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শঙ্করাচার্যের কথা ভাবলে গা রোমাঞ্চিত হয়, ভাবি শঙ্করাচার্য কি একজন, না শত সহস্রজন! মাত্র বত্রিশ বছর, মহাকালের কাছে কতটুকু সময়! এ সময়েরে মধ্যে একজন ব্যক্তি এত অসাধারণ কীর্তিকির করে করলেন; এই সামান্য সময়েরে মধ্যে কভাবে তিনি এত জনপদে ঘুরে বেরিয়েছেন; কি কৌশল অবলম্বন করে কটকটকি মানুষকে সনাতন ধর্মেরে সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে এসেছেন; এত ব্যস্ততার মধ্যেও কভাবে তিনি ১৫১টা অমূল্য গ্রন্থেরে রচনা করেছেন; এবং এত সুসংবদ্ধ, অনন্য, অভূতপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা তিনি কোথায় পেলেন?

শঙ্করাচার্যের সমতুল্য ব্যক্তি ভারতবর্ষে তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমাদের দূরভাগ্য আমরা শঙ্করাচার্যের যোগ্য উত্তরসূরিত পাবনি। আচার্যের জীবনে আমরা দেখি যা কিছু সনাতন ধর্মেরে সমৃদ্ধিবিচক কাজ করেছে তা তাঁর জীবৎকালেই হয়েছে। তাঁর অন্তর্ধানের পরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রকোপ এবং

যোগ্য নতৃত্বের অভাবে চারমঠ আচার্যের জীবৎকালরে ন্যায় নতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার কারণেই অনন্য অসাধারণ কাজের পরেও আচার্য শঙ্করকে আমরা ভুলতে বসেছি। আজ শঙ্করাচার্যের উক্তি বিভিন্ন গুরু এবং গুরুরূপী ভগবানগণ (!) নজিদের নামে চালিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছে। কারণ এ কুম্ভীলকদের ধরবে কে? এর জন্য আমরাও কম দায়ী নয়। যতদনি যাচ্ছে তত বেশি করে আমরা মূল বৃক্ষকে ছেড়ে শাখা প্রশাখায় য়ে বসছি এবং তাকেই মূল বৃক্ষ বলে অভিমান করছি। সনাতন বৈদিক রাজপথ ছেড়ে কতগুলো অপরচ্ছিন্ন অলগিলতি য়ে পথহারা পথকি য়ে বসে আছি। অলগিলতি চলতে চলতে আমরা টরেও পাচ্ছি না য়ে আমরা পথহারা। ভগবানের অবতারের নামে হাইব্রীড ফসলে সারা দেশে য়ে যাচ্ছে। ভণ্ড পাষণ্ড মথিয়া অবতারদের কারণে সনাতন হিন্দু সমাজ নুয়ে নুয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য মত পথের জঞ্জালে আমাদের যুবকসমাজ পথহারা, ভ্রান্ত, বপিথগামী য়ে সনাতন ধর্ম, সমাজ এবং পারিবারিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। পরণামে কটে হচ্ছে মানসিক হীনমন্য, কটে বছেছে নচ্ছিছে ধর্মান্তর, কটেবা য়ে যাচ্ছে ঘোরতর নাস্তিকি।

আজ নমিজ্জমান হিন্দু জাতিকে রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শঙ্করাচার্যের ন্যায় তজেদীপ্ত নায়ক, সংগঠক এবং ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী মহামানবের। সেই পারবে হিন্দু সমাজের অনাকাক্ষিক্ষিত জঞ্জালকে বদীরতি করে ঐক্যবদ্ধ সুসংবদ্ধ জাততিে পরণিত করতে। নতুন এক সূর্য্যোদয়ের আকাক্ষিক্ষায় সেই মহামানবের প্রতীক্যায় আছি আমরা।

